Vol. 1 | No. 2 | 1957

Check for updates

# সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

লায়লী-মজনু


| | |
|---|---|
| Volume | 1 |
| Issue | 2 |
| Year | 1957 |
| ISSN | 0558-1583 |
| eISSN | 3006-886X |
| Author(s) | Anisuzzaman |
| Published online | December 16, 1957 |
| DOI | 10.62328/sp.v1i2.5 |
| Link to article | https://doi.org/10.62328/sp.v1i2.5 |
| Pages | 197-202 |
| Publisher | University of Dhaka |
| Copyright | সাহিত্য পত্রিকা |
| Designed and Developed by | Zobayer Abdullah |

Check for updates

# গ্রন্থ-পরিচয়

লায়লী-মজনু : দৌলত-উজীর বাহরাম খান। সম্পাদক : অধ্যাপক আহমদ শরীফ। প্রকাশক : বাঙ্‌লা একাডেমী, ঢাকা। মোট পৃষ্ঠা ৩৩০। দাম : সাড়ে তিন টাকা॥

কয়েকমাস হল বাঙ্‌লা একাডেমীর প্রাচীন সাহিত্য সংরক্ষণ গ্রন্থমালার প্রথম বই দৌলত-উজীর বাহরাম খান-বিরচিত কাব্যগ্রন্থ "লায়লী-মজনু" প্রকাশিত হয়েছে। এই কাব্যটির সন্ধান দেন মরহুম আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ এবং তাঁরই সংগৃহীত ও বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত চারটি পুথি অবলম্বনে বর্তমান সংস্করণ প্রস্তুত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের গবেষণা সহায়ক হিসেবে অধ্যাপক আহমদ শরীফ এই কাব্য সম্পাদনার কাজ সম্পন্ন করেছেন।

লায়লী-মজনুর প্রণয়কাহিনী সর্বজনবিদিত। এই কাব্যের পাত্র-পাত্রী যদিও আরব দেশবাসী বলে কথিত হয়েছেন, তবু আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে এই উপাখ্যানের উল্লেখ দেখা যায় না। ফার্সী সাহিত্যে লায়লী-মজনু কাব্যের প্রথম রচয়িতা হিসেবে আমরা যাঁকে জানি, তিনি হচ্ছেন নিজামী ( ১১৪১—১২০৩ খৃঃ )—যিনি 'খুসরৌ ও শিরি" 'লায়লা ও মজনু" 'হফ্‌ত পয়কর' এবং 'ইসকান্দর নামা' লিখে বিখ্যাত হয়েছিলেন। তবু নিজামীর বহু পূর্বে খৃষ্টীয় দশম শতকের ফার্সী কবি রুদাগীর কবিতায় লায়লা-মজনুর উল্লেখ আছে : একথা আমরা অধ্যাপক রিউবেন লেভী-রচিত Persian Literature গ্রন্থটি থেকে জানতে পারি। অতএব, এই উপাখ্যানের বয়স যে বাংলা সাহিত্যের বয়সের সমান, এতে সন্দেহ নেই। তবু অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলায় একটিমাত্র লায়লী-মজনু কাব্যেরই সন্ধান আমরা পেয়েছি, আর সেই কাব্যরচনার গৌরব অর্জন করেছেন কবি বাহরাম খান।

যে যুগের আদর্শ ছিল মিলনান্ত কাব্য রচনা, সে যুগের কবি হয়েও বাহরাম খান বিয়োগান্ত কাব্য রচনা করে নিজের কবিপ্রতিভার মৌলিকতা দেখিয়েছিলেন।

এ কাব্য বিশেষ কোন ফার্সী কাব্যের হুবহু অনুবাদ নয়, মধ্যযুগে অনুবাদ বলতে যা বোঝাতো, তাই। অর্থাৎ তা কবিমনের অভিলাষ-অনুযায়ী মূলের নবরূপায়ণ, অতএব, কবির রচনাশক্তির পরিচায়ক। সেই পরিচয় থেকে কবি বাহরামকে আমরা একজন উঁচুদরের কবি বলে অনায়াসে চিহ্নিত করতে পারি। তাঁর ভাষা সংস্কৃতানুগ এবং একাধারে মার্জিত ও মধুর। হৃদয়াবেগ-প্রকাশে তাঁর কৃতিত্ব অবিসংবাদী। তাঁর রচনাভঙ্গী লালিত্যময় ও সরস। এই সরসতায় আস্থা ছিল বলেই কবি হয়তো কাব্যে আদিরসের প্রবাহ বইয়ে দেবার প্রয়োজন বোধ করেন নি, বরঞ্চ রচনারীতির এই সংযম তাঁর কাব্যকে মর্যাদাবান করেছে। মোটকথা, মধ্যযুগের বাঙালী মুসলমান কবিরা ধর্মনিরপেক্ষ মানবীয় প্রণয়োপাখ্যানের প্রবর্তন করে বাংলা কাব্যধারায় যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেছিলেন, সেই ক্ষেত্রে বাহরাম খান ছিলেন একজন পথিকৃৎ।

আশ্চর্যের বিষয়, এই কবি বা তাঁর কাব্য নিয়ে বাংলা সাহিত্যের প্রচলিত ইতিহাসগুলোয় তেমন উৎসাহ প্রকাশ করা হয় নি। 'নবনূর' পত্রিকায় ১৩১০ সালে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ এবং 'মাসিক মোহাম্মদী'তে ১৩৪৬ সালে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক এই কাব্যের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দিয়েছিলেন, কিন্তু তারপরও এ সম্পর্কে সাধারণভাবে নামোল্লেখ বা দু একটি প্রাসঙ্গিক মন্তব্য ছাড়া সাহিত্যের ইতিহাসে আর কিছু চোখে পড়ে না। পুস্তকাকারে প্রকাশের পর এই কাব্যের প্রতি ঐতিহাসিকদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকৃষ্ট হলেই সম্পাদকের শ্রম ও প্রকাশকের উদ্যম যথাযোগ্য পুরস্কার লাভ করবে।

চারটি পাণ্ডুলিপির সাহায্যে অধ্যাপক শরীফ এই কাব্যের একটি composite text তৈরী করেছেন। তিনি প্রধানত তিনটি ( ২২৪, ২২৭ ও ৬৫৪ সংখ্যক ) পুথির উপরে নির্ভর করেছেন এবং একটি পুথির পাঠ বিভ্রান্তিকর বিবেচনা করে এতে সন্নিবেশিত অতিরিক্ত পাঠ পরিশিষ্টে যোজনা করেছেন। পাঠান্তর দিয়ে পুস্তক ভারাক্রান্ত করতে তিনি ইচ্ছা করেন নি।

কাব্যগ্রন্থটির প্রথমে একটি সুদীর্ঘ ভূমিকায় সম্পাদক এই কাব্যের পাঠ-পরিচয় ও উপাখ্যান-পরিচিতি দিয়েছেন এবং কবি বাহরাম খানের পরিচয়, কালনির্ণয়, কাব্যের

বৈশিষ্ট্য ও ভাষার কথা আলোচনা করেছেন। ভূমিকাটি সম্পাদকের পরিশ্রম, পাণ্ডিত্য ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার সাক্ষ্য বহন করে।

কবি বাহরাম খান যে চট্টগ্রামবাসী ছিলেন, একথা সর্ববাদিসম্মত। তবে তাঁর কাল সম্পর্কে আমাদের সম্যক ধারণা নেই। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' কবির নাম নেই। ডক্টর তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্তের 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে' কবির নামোল্লেখ আছে মাত্র। 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (প্রথম খণ্ডে) ডক্টর সুকুমার সেন কবি বাহরামের কথা আলোচনা করেছেন অষ্টাদশ শতকের কয়েকজন কবির অব্যবহতি পূর্বে; 'ইসলামি বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে তিনি "চাটিগাঁয়ের পুরানো কবিদের অন্যতম" বলে কবিকে চিহ্নিত করলেও 'লায়লী মজনু'র রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দী বলেই মনে করেছেন। 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য় (১২ বর্ষে) আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ কবিকে অষ্টাদশ শতাব্দীর বলে মনে করেছেন। 'মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলমান' প্রবন্ধে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ লিখেছেন : "শেরশাহের (১৫৩৯-৪৫ খ্রীঃ) ভ্রাতা নিযাম শাহ সূরের রাজত্বকালে দৌলত-উজীর বাহরাম খান লায়লী মজনু নামে এক প্রেম-কাহিনী রচনা করেন।" ১৩৪৬ সালে প্রকাশিত এবং আলোচ্য গ্রন্থের শেষভাগে সংকলিত প্রবন্ধে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক 'লায়লী-মজনু' কাব্যের রচনাকাল স্থির করেন ১৫৪৫ থেকে ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে : এই মত পরিবর্তন করে 'মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য' গ্রন্থে তিনি কাব্যরচনার কাল ১৫৬০ থেকে ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্তী বলে নির্দেশ করেছেন। অধ্যাপক আহমদ শরীফ প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, ১৫৪৫ থেকে ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে 'লায়লী-মজনু' রচিত হয়।

অধ্যাপক শরীফের এই মত দুটি বড়রকম অনুমানের উপর নির্ভর করছে : (১) Compos রচিত History of the Portuguese in Bengal এ উল্লেখিত Nogazil হচ্ছেন কবি বাহরামের আশ্রয়দাতা নিজাম শাহ্ সুর এবং ইতিহাসে অনুল্লেখিত এই নিজাম শাহ্ সম্ভবত শেরশাহের ভ্রাতা ছিলেন; (২) শেরশাহের মৃত্যুর (১৫৪৫ খৃঃ) পর সম্ভবত তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র ইসলাম শাহ সুরের (রাজত্বকাল : ১৫৪৫-৫৪) অধীনতা অস্বীকার করে চট্টগ্রাম শাসন করতে থাকেন। ঐতিহাসিক উপাদানের

অভাবে অনুমানের সুযোগ আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু এই প্রসঙ্গে দু একটি কথা উল্লেখ করা দরকার।

ধরে নেওয়া গেল যে, ইসলাম শাহের দাবী সম্পুর্ণ অগ্রাহ্য করে নিজাম শাহ চট্টগ্রামে "একশত ছত্রধারী সভানের অধিকারী

ধবল অরুণ গজেশ্বর"

হয়ে বসেছিলেন। তিনি কবির পিতা মোবারক খানকে তাঁর দৌলত-উজীর (অর্থমন্ত্রী) নিযুক্ত করেছিলেন, মোবারক তাঁর প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন এবং উক্তপদে অধিষ্ঠিত থাকাকালে মোবারকের মৃত্যু হয়েছিল। তখন

"পিতাহীন শিশু জানি দয়া ধর্ম্ম মনে মানি

বাপের খেতাব দিলা মোরে।"

সম্পাদকের মতে, কবির পিতার "অকালমৃত্যু"র সময়ে কবি "শিশু" (বা "কিশোর") ছিলেন এবং দৌলত-উজীর হবার পর তিনি 'লায়লী-মজনু' রচনা করেন (পৃ ১১, পৃ ১৫)। নিজামের একচ্ছত্র আধিপত্যপ্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে কবির কাব্যরচনার সমাপ্তি পর্যন্ত এতগুলো ঘটনা মাত্র আট বৎসরের (১৫৪৫-১৫৫৩) মধ্যে ঘটেছিল বলে যদি আমাদেরকে স্বীকার করতে হয়, তাহলে একথাও বলতে হয় যে, 'লায়লী-মজনু' নিতান্তই বালভাষিত। কিন্তু কাব্য পাঠ করলে যে "রুচিবান ও পরিমিতিজ্ঞানসম্পন্ন কবি"র পরিচয় আমরা পাই, কিশোরের পক্ষে সেই পরিণতি অর্জন করা সহজ ব্যাপার নয়। তাই একথা স্পষ্ট যে উদ্ধৃত পংক্তির "শিশু" শব্দটিকে আভিধানিক অর্থে গ্রহণ করা চলে না (যদিও সম্পাদক তাই করেছেন); কারণ, এ শিশু 'দৌলত-উজির'ও হন এবং কাব্য রচনাও করেন। 'পিতাহীন শিশু' কথাটা কবি হয়তো পিতৃহীন অবস্থা বোঝাতে ব্যবহার করেছেন। এতে কবিপিতার "অকালমৃত্যু"-কল্পনার কোন ভিত্তি থাকে না।

এখন দেখা যাচ্ছে যে, কবির পূর্বপুরুষ হামিদ খানের চট্টগ্রাম-অধিকারী হওয়া (আনুমানিক ১৫১৬ খৃঃ) এবং কবিপিতার মন্ত্রীত্বলাভের (আনুমানিক ১৫৪৬ খৃঃ) মধ্যে পার্থক্য ত্রিশ বৎসরের বেশী নয়। এই হিসাবে মোবারক

হামিদ খানের পুত্র না হোন, পৌত্র ছিলেন ( অবশ্য পুত্র হতেও বাধা নেই )। অথচ কবি বলছেন,

"এই যে হামিদ খান আদ্যের উজির জান
তাহান বংশেতে উৎপতি।
মোবারক খান নাম রূপে গুণে অনুপাম
সদাএ ধর্ম্মেত তান মতি॥"

হামিদ খানের প্রতি কবি যে অসাধারণ শ্রদ্ধানিবেদন করেছেন, তাতে বোঝা যায়, তিনি মোবারকের পিতা বা পিতামহ হলে কবি সেকথা উল্লেখ করতে ছাড়তেন না। অথচ এই সংক্ষিপ্ত সময়ে হামিদ খানের সঙ্গে তাঁর দূর সম্পর্ক অনুমানের সুযোগ নেই। আবার, হামিদ খান সম্পর্কে কবি যে সব অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ করেছেন, তা থেকে মনে হয় যে, তাঁদের মধ্যে সময়ের ব্যবধান কম নয়। এই বংশ পরিচয় কি তাহলে কবির আরো পরবর্তীকাল নির্দেশ করে ?

অবশ্য এই সমস্যার একটি সমাধানও আছে। হামিদ খান যে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হোসেন শাহেরই কর্মচারী ছিলেন, এমন নাও হতে পারে। হোসেন শাহের অসাধারণ জনপ্রিয়তার ফলে তাঁর আগের ও পরের অনেক ঘটনা লোকের মুখে মুখে তাঁরই নামে প্রচলিত হয়ে গেছে, একথা সুবিদিত। এমনও হতে পারে যে, হামিদ খান হোসেন শাহের পূর্ববর্তী ছিলেন—কেবল গৌরব বৃদ্ধি হবে মনে করে কবি বা তাঁর পূর্বপুরুষেরা তাঁকে হোসেন শাহের 'প্রধান উজির' বলে দাবী করেছেন।

এই কাব্যের রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দী বলে মনে করবার একটিমাত্র যুক্তি আছে। তা এই যে, একটি পুথিতে ( ২২৪ সংখ্যক ) আওরঙ্গ (জেব) শাহার প্রশস্তি আছে। কিন্তু অন্যান্য পুথিতে এই অংশ পাওয়া না যাওয়ায় সম্পাদক একে প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করেছেন এবং সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কিছু বলবার নেই।

মোটকথা, চট্টগ্রামের ইতিহাস-সম্পর্কিত অধিকতর তথ্য উদ্‌ঘাটিত না হওয়া পর্যন্ত অধ্যাপক শরীফ-প্রদত্ত দৌলত উজীর বাহরাম খানের কালই আমাদেরকে মেনে নিতে হবে। এই কাল-অনুযায়ী বাহরাম খান আলাওল এবং দৌলত কাজী, উভয়েরই পূর্ববর্তী ছিলেন।

শব্দার্থ, টীকা ও টিপ্পনীতে সম্পাদকের পরিশ্রম ও কৃতিত্বের পরিচয় আছে।

কাব্যগ্রন্থের শেষে সংকলিত ডক্টর এনামুল হক রচিত 'দৌলত-উজীর বাহরাম খান' প্রবন্ধে এই কাব্যটি সম্পর্কে বিস্তৃত ও সুলিখিত আলোচনা আছে। তিনি এই কাব্যে ফার্সী কাব্যের সৌন্দর্য ছাড়াও সংস্কৃত কাব্যের প্রভাব নির্ণয় করেছেন। এ থেকে আমরা কবির পাণ্ডিত্যের কথা জানতে পারি।

এই সুসম্পাদিত কাব্যগ্রন্থের একমাত্র ত্রুটি মুদ্রণকার্যের। আজকের দিনে বইয়ের ছাপা ও গেট-আপ ভাল হওয়া অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। মুদ্রণকার্যে সেই সুরুচির অভাব বইখানির সর্বত্র সুস্পষ্ট। তার উপর মুদ্রণ প্রমাদ আছে, এমন কি তিনপৃষ্ঠার শুদ্ধিপত্রের বাইরেও। ছাপা বাঁধাই অঙ্গ-বিন্যাস ভাল হলে এ বই বিশেষজ্ঞ ছাড়া সাধারণ পাঠকদের কাছেও আদরণীয় হতে পারত। পরবর্তী সংস্করণ এদিক দিয়ে উন্নত হবে বলে আশা করা যায়।

আমাদের এক বিস্মৃত সম্পদ পুনরুদ্ধার করে সম্পাদক ও প্রকাশক সাহিত্যরসিক ব্যক্তিমাত্রেরই ধন্যবাদভাজন হয়েছেন।

**আনিসুজ্জামান**